হৃদয় দিয়ে অতীত দর্শন

বেড়াতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি ঘুরে এলেন শিল্পতীর্থ অজন্তা-ইলোরা। ভালোলাগাকে এবার ভাগ করে বাড়িয়ে নিচ্ছেন শুভেন্দু ভৌমিক।

২৯ সেপ্টেম্বর হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে নাসিক পৌঁছলাম। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ-র অন্যতম 'ত্রম্ব্যকেশ্বর' দর্শন করে সিরিডি সাঁইনাথ দর্শন করে রওনা দিলাম অজন্তা-ইলোরার দিকে। অজন্তা-ইলোরার গল্প ছোটবেলা থেকেই ইতিহাস হয়ে মনে গেঁথে আছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি দূর্গাপুজোর অবসরে দুই অফিসবন্ধু এসেছি সেই ইতিহাস স্বচক্ষে দেখতে।

৩০ সেপ্টেম্বর। ভোরবেলা স্নান সেরে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে আমরা সকাল সকাল রওনা দিলাম অজন্তার পথে। ঘন্টা চারেক পর পৌঁছলাম অজন্তার কাছে, তারপর পরিবেশ বান্ধব (ব্যাটারি চালিত) বাসে চড়ে বসলাম। শুরু হল পাহাড় জুড়ে অরণ্যপথ। ঘন বনপথ চলে গেছে অজন্তার দিকে। ধীরে ধীরে বাস পাহাড়ে উঠতে লাগল। থামল একেবারে অজন্তার গুহার পাদদেশে। অজন্তার গুহাগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে। অনেক নীচে বাঘোরা নদী। গুহাগুলি সব এক স্তরে নয়। বিভিন্ন উচ্চতায় একেকটি গুহা। গাইড বলে চলেছেন অজন্তা গুহার দীর্ঘ ইতিহাস।

অজন্তা হল গুহানগরী। সহ্যাদ্রি পর্বতমালার কোলে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে (সম্ভবত সাতবাহন যুগে) আট নয়শো বছর ধরে প্রায় তিরিশটি গুহা নির্মাণ করেন অসংখ্য শিল্পী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল। কিছুগুহা অবশ্য আগে থেকেই সেখানে ছিল। মধ্যভাগে প্রাচীনতর হীনযান আমলের গুহাগুলি দু'প্রান্তে ক্রমশ মহাযান যুগের নবীনতর গুহাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিরিশটি গুহার মধ্যে পাঁচটি চৈত্য বা উপাসনাগৃহ – ৯,১০,১৯,২৫ ও ২৯ নম্বর গুহা। বাকি পঁচিশটি হল বিহার বা বৌদ্ধ শ্রমণদের বিশ্রামস্থল। অজন্তার চিত্রগুলি তিন প্রকারের – একক চিত্র, কাহিনী চিত্র ও নকশা। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে সাতবাহনদের রাজত্বকালে মধ্যবর্তী গুহাগুলি (৮,৯,১০ এবং ১২) তৈরি হয়। সেই সময় বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণের প্রচলন ছিল না। বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত পদ্মফুল, স্তুপ, ধর্মচক্র ইত্যাদি। হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধরা ছিলেন জ্ঞানমার্গী।

তারা স্তুপ নির্মাণ করে প্রার্থনা করতেন। বুদ্ধের মূর্তি কল্পনা বা খোদাই শুরু হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়। সেখান থেকে শুরু মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্ম। তারা ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। সম্ভবতঃ ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পল্লবদের হাতে দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হওয়ার পর অজন্তা রাজ-অনুগ্রহ হারাতে থাকে। শিল্পী, ভিক্ষুকরা বিদায় নেন এবং ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে ঘন অরণ্যে ঢেকে যায় গুহাগুলি। এরপর একটা দীর্ঘ সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় এই অনবদ্য কীর্তি।

এরপর ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জন স্মিথ তার সেনাদল নিয়ে বাঘোরা নদীতীরে গভীর জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। একটি বাঘকে তাড়া করতে করতে পৌঁছে যান পাহাড়ের মাথায়। হঠাৎ নজরে পড়ে নদীর ওপারে পরিত্যক্ত গুহাস্তুপ ও ভাঙ্গা খিলান। ফিরে এসে তিনি সবকিছু জানান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে তা প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে হায়দ্রাবাদের নিজাম গুহাচিত্রগুলো সংরক্ষণের জন্য পুরাতত্ত্ববিভাগ চালু করেন।

আমাদের গুহাদর্শন শুরু হল ১ নম্বর গুহা থেকে। এটি মহাযানদের আমলে তৈরি। এখানে জাতকের নানা কাহিনী চিত্রিত আছে। এখানে রাজমুকুট পরিহিত পদ্মাসনে বুদ্ধমূর্তিটি অসাধারণ। এই গুহাতে সর্বকালের সেরা বেশকিছু চিত্রকলা পাওয়া যায়। প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার বছর আগের গুহাচিত্রগুলিতে তুষের গুঁড়ো, চুন, ভুষোকালি, গ্রিন রক, গোমল ইত্যাদি ব্যবহৃত হত।

দ্বিতীয় গুহাতে আছে পাঁচটি কক্ষ ও দুটি ভজনালয়। ছাদ সুন্দরভাবে চিত্রিত। এই গুহাটি বারোটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবেশপথের ডানদিকে একটি চিত্র খুব নজরকারা। উদ্যত তরবারি হাতে ক্রুদ্ধ রাজা আর তার হাঁটু ধরে প্রাণভিক্ষারতা এক অসহায় নারী। একটি চিত্রে দোলনায় এক নারীমূর্তি। অদ্ভুত সমানুপাতে তার দোলনার দড়িটি চিত্রিত। দশমগুহাটি প্রাচীনতম চৈত্য গুহা। এইটি শিকারের সময় প্রথম নজরে আসে স্মিথ সাহেবের।

গুহাগুলির মধ্যে নজর কাড়ে বেশকিছু নরনারীর যুগলমূর্তি যার কিছু আবার ছাদে সুন্দর নিখুঁতভাবে খোদাই করা। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ, পাগড়ি, অলঙ্কার সবকিছুতেই সেই যুগের রাজকীয় স্বতন্ত্রতা। চৈত্য-গুহাগুলি লম্বাটে এবং বৃহৎ হলঘরের শেষপ্রান্তটি অর্ধগোলাকার। সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বৌদ্ধস্তুপটি। চোখ চলে যায় চৈত্য-হলের ছাদের দিকে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছাদে পরপর সরু বিম খোদাই করা যার বয়স প্রায় দু'হাজার

বছর। আজও অক্ষত। শ্রমণদের আবাসকক্ষস্থলগুলিও আকর্ষণীয়। কক্ষের সংকীর্ণ দরজা, দুদিকে পাথরের কঠিন শয্যা। ১৯ নম্বর গুহার সূর্যগবাক্ষ মোহিত করে। অজন্তার গুহাগুলি সারাদিন সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকত। এ এমনই এক পর্বতশ্রেণী যা অর্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত।

আমরা ইতিহাসবিদ নই। একজন শিল্পপ্রেমী হিসেবে গুহাগুলির ভাস্কর্য ও চিত্রকলা দেখতে গিয়েছি। অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে হয় এই শিল্পকর্ম। কিন্তু দুঃখ পেতে হয় এগুলির বিবর্ণ অবস্থা দেখে।

সারাদিনের শেষে গন্তব্য ১০৫ কিলোমিটার দূরের ঔরঙ্গাবাদ। হোটেলে ফিরে সারারাত বিশ্রাম।

পরদিন সকাল সকাল আবার রওনা। এবার ইলোরার পথে। পথে প্রথম দ্রষ্টব্য শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দশম লিঙ্গ ঘৃষ্টেশ্বর মন্দির। অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এর গর্ভগৃহে প্রবেশকালে পুরুষদের উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখার নিয়ম। মহিলাদের কোনও সমস্যা নেই।

মন্দির থেকে অটোতে চেপে মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেলাম বহু আকাঙ্খিত সেই ইলোরা গুহামন্দির। মৌর্যযুগে সাঁচি বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে শিল্পরীতির যে উন্মেষ ঘটেছিল তা ক্রমে পরবর্তী সাতবাহন যুগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে। এর ফলস্বরূপ মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্দরে বৌদ্ধমন্দির ও স্থাপত্যের অপূর্ব ভাণ্ডার উপহার পাই আমরা। দাক্ষিণাত্যের কঠিন ব্যাসল্ট পাথরের পাহাড়গুলিতে বৌদ্ধশিল্পীদের কয়েকশো বছরের নিরলস পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল এই সাধনস্থল।

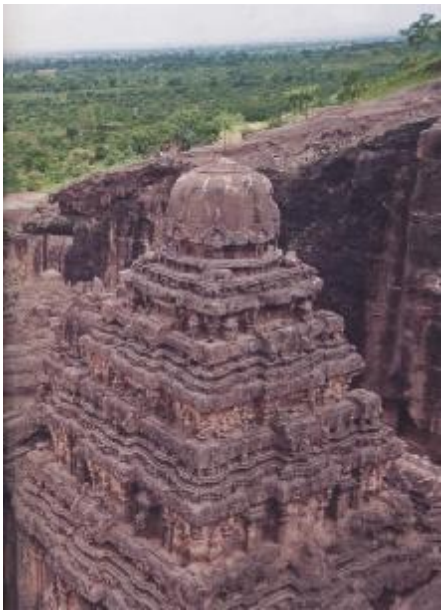

ইলোরার চৌত্রিশটি গুহা প্রায় দুই কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্রায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক জুড়ে পাহাড় কেটে গুহাগুলি তৈরি হয়। প্রথম বারোটি গুহা মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের। মাঝে সতেরোটি হিন্দুদের এবং শেষের পাঁচটি জৈনদের। এরমধ্যে বেশি ভালো লাগে ৫,৬,১০,১৫,১৬,২১,৩২ ও ৩৪ নম্বর গুহাগুলি।

১৬ নম্বর গুহা হল কৈলাশ গুহা। অষ্টম শতকে রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়ে তৈরি মনোলিথিক গুহা, যা একটি পাহাড়ের উপর থেকে কাটতে কাটতে শিল্পীরা নিচে নেমেছেন। প্রায় দেড়শো বছর সময় নিয়ে এই গুহাটি তৈরি করা হয়েছে। এই গুহায় প্রবেশ

করলে মনে হয় কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছি কোনও নগরীতে। ভাষাহীন এক বিস্ময়, অদ্ভুত অনুভূতি। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি। ভিতরে দুটো সুউচ্চ ধ্বজস্তম্ভ। গুহাটির বিভিন্ন তলের দেওয়াল জুড়ে শিব-পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, কালভৈরব মূর্তি খোদাই করা আছে। এই গুহাটিই ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' গল্পটির প্রেক্ষাপট।

হিন্দু ও বৌদ্ধগুহাগুলির মধ্যে ১২ নম্বর গুহাটি তিনতলা। এর মধ্যে ১ নম্বর গুহা প্রাচীনতম। এরপর চললাম এক কিলোমিটার দূরের জৈন গুহাগুলি দেখতে। এরমধ্যে ৩২ নম্বর গুহা 'ইন্দ্রসভা'।

ইলোরা দর্শন শেষে বাইরে এসে অবাক বিস্ময়ে গুহাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। ভারতবর্ষের এক অমূল্য সম্পদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে ঘোর এসে গিয়েছিল। সম্বিৎ ফিরল আমার সঙ্গীর ডাকে। ফিরে তো যেতেই হবে!

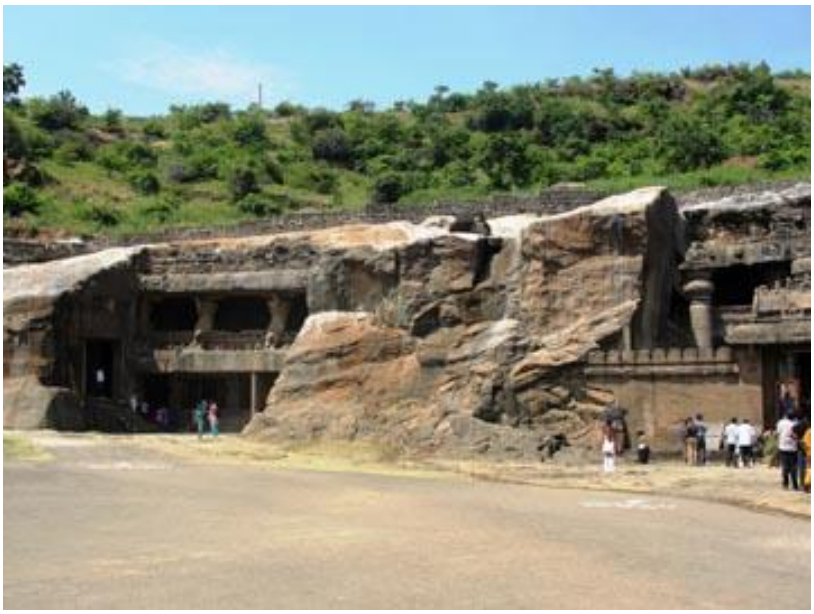

তথ্য : *অজন্তা প্রতি সোমবার ও ইলোরা প্রতি মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া থেকে রওনা দিলে জলগাঁও-তে নেমে অজন্তা দর্শন করে তারপর ঔরঙ্গাবাদ (১৬২ কিলোমিটার) গিয়ে ইলোরা দর্শন করা যায়। অথবা ভূসওয়ালে নেমে সোজা ঔরঙ্গাবাদ, এবং সেখান থেকে অজন্তা-ইলোরা দর্শন করা যায়।*

- ছবিগুলি লেখকের নিজের তোলা।